প্রথম আলো

ভ্রমণ

হায় গুগল, তুমি কোথায় নিয়ে এলে এই রাত্রিবেলা!

মাদাগাস্কারে গিয়েছিলেন বাংলাদেশি চার সাইক্লিস্ট। আফ্রিকার দ্বীপরাষ্ট্রটিতে সাইকেলে ঘুরে দারুণ দারুণ সব অভিজ্ঞতা তাঁদের হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতাই সবার সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন **মুনতাসির মামুন**। আজ পড়ুন চতুর্থ পর্ব

ছুটির দিনে ডেস্ক

সাইকেলের প্যাডেলে যখন প্রথম পা দিলাম, তখন ছয়টাও বাজেনি। আনতানানারিভো যে হোটেলে উঠেছি,

সাইকেলের বাক্সগুলো সেখানেই রাখা। ফেরার পথে এখানেই থাকার পরিকল্পনা।

হেরিংবন রাস্তা থেকে ডানে যেতে হবে। গতকাল গাড়ি নিয়ে এদিকে রেকি করে এসেছি, যেন শুরুতেই কোনো সমস্যা না হয়। সিকি কিলোমিটার যাওয়ার পর রাস্তা এবার বাঁয়ে মোড় নিয়ে খাড়া ওপরে উঠে গেছে। গত দিনই বুঝেছিলাম, এটা কঠিন পরীক্ষা হবে। তুলনামূলক কোনো শহরের মধ্যে এমন খাড়া রাস্তা আগে দেখিনি। মাঝবরাবর আসা গেল। নামতে হলো। আমাদের পেছনে সবুজ সাইকেলে চঞ্চল আর সালমা আপা। আমি আর শামিমা আপা লাল সাইকেলে। অভিজ্ঞতায় আমাদের পাল্লা ভারী। তাই সাইকেলে আমাদের গতি তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু এমন শুরুর সময় একসঙ্গে থাকাই শ্রেয়। তাই নেমে গেলাম। এবার ঢালটা সামান্য বাঁয়ে মোড় নিয়ে একটা বাজারের মাঝ দিয়ে চলে গেছে। সাইকেলে উঠে এগিয়ে যেতে থাকলাম। যানবাহনের মধ্যে ছোট পুরোনো গাড়ি, মোটরসাইকেল, সাইকেল আছে। স্কুলের বাস দেখা গেল বেশ কয়েকটা। রাস্তা আশঙ্কাজনক রকম সরু। ওপর দিক থেকে আসা গাড়ির সঙ্গে টক্কর লাগার আশঙ্কা পদে পদে। সামনে এগিয়েছি আবার ডানে মোড়, সঙ্গে চড়াই। আমি নিশ্চিত, এই চড়াইয়ে চঞ্চল সাইকেল সামলাতে পারবে না। শেষ বাঁকটা যেহেতু আগেই আমরা নিয়ে ফেলেছি, তাই কয়েক শ মিটার এগিয়ে সাইকেলটা থামালাম। শামিমা আপা বাঁকের মাথার দিকে হাঁটা ধরলেন, যেন চঞ্চলেরা সোজাসুজি রাস্তায় চলে না যায়। যদিও ওদের সঙ্গেও ফোন আছে, তবু একটু নিজেদের এগিয়ে গিয়ে পথ দেখানো সমীচীন মনে হলো।

আমাদের সাইকেলে পেছনের হাতলে ফোন লাগানো ছিল। শহর পেরিয়ে হাইওয়েতে উঠে গেলে আর এর দরকার পড়বে না। চঞ্চলদের পথ দেখিয়ে শামিমা আপা যখন সাইকেলে উঠবেন, তখন এক ভদ্রমহিলা গাড়ি থেকে নেমে এসে বললেন ফোনটা ওভাবে না রাখতে। কেউ ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে পারে। ভালো উপদেশ। ক্রেডল থেকে খুলে বারব্যাগে রাখা হলো।

এই চড়াইয়ের পর সমতল আর মূল সড়ক। আট কিলোমিটার আসতে প্রায় দেড় ঘণ্টা। চঞ্চলেরা অনেক পেছনে। রাস্তার বাঁ পাশে একটা টিনের চালাওয়ালা দোকানের সামনে লাল মাটির ফাঁকা জায়গায় থামলাম। রাস্তা এখানে মসৃণ আর পাকা। উঁচু-নিচু থাকবে বোঝা গেল সামনে পাহাড় দেখে। গাড়ি কদাচিৎ। পায়ে হাঁটা মানুষ আছে দু-একজন। টিলার মতো ঢিবিগুলো অদূরে। ছোট গাছ আর মাঝেমধ্যে দু-একটা বড় গাছ বেড় দিয়ে রেখেছে রাস্তাটাকে। আজ আর পুরোনো গাড়ি দেখলাম না। হয়তো নতুন মডেলের রেনোঁ কিংবা জাপানি পরিচিত কোনো গাড়ি। ঝকঝক করছে।

ডানপন্থী যাত্রা

চঞ্চলদের দেখা গেল হেঁটে আসতে। সামনে চাকার হাওয়া কমে গেছে। তাই হাঁটা। হাওয়া দিয়ে শুরু করতে করতে ঘড়িতে নয়টা। শুরুতেই আধঘণ্টা চলে গেল। তবে সময় আরও চলে গেল শুরুর মিনিট কয়েক পরই ঢাল বেয়ে উঠতে।

বিরামহীন লম্বা ঢাল। খুব উঁচু নয় কিন্তু লাগাতার উঠে যাওয়া। ওদের খবর হবে, আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম। ক্রমে দুই সাইকেলের দূরত্ব বাড়ছে। এভাবে আরও বাড়বে। ঢালে উঠতে ওদের সময় আমাদের চেয়ে বেশি লাগবে, এটা জানা কথা। রাস্তা যেহেতু আর বদলাতে হবে না, আমরা আমাদের গতিতে এগিয়ে গিয়ে কোনো একটা দোকান যদি পাওয়া যায়, তো সেখানে অপেক্ষা করব, এই নিয়তে পা চালালাম। ঢালে থামার লক্ষণ নেই। উঠছি তো উঠছিই। কতক্ষণ হবে, তার ইয়ত্তা নেই। অনতিদূরে রাস্তার ডান পাশে চকচকে লাল রঙের বড় একটা সাইনেজ দেখতে পেলাম। দোকান হবে। তা-ও আরও এক কিলোমিটার তো হবেই। ওখানেই থামব। ওদের আসতে যে কত সময় লাগবে, তার হিসাব চলছে মাথায়। প্রথম বিরতির আধঘণ্টার মাথায় দোকান পেলাম। রেস্তোরাঁ কাম দোকান। গাড়ি থামে এখানে। আগে এমন কোনো স্থাপনা চোখে পড়েনি। হালকা কিছু খাওয়াও যাবে, সঙ্গে চঞ্চলদের জন্য অপেক্ষা করা।

হোটেল মানানটেনাসোয়া—এই হলো হোটেলের নাম। এখানে অবশ্য থাকার ব্যবস্থা নেই। শুধু খাওয়া আর দোকানে কেনার মতো জিনিস। এলাকার নাম আম্বানিতসেনা। মনে রাখা কঠিন। একটা গাড়ি এসে থামল। আমরা এ ধরনের গাড়িকে মিনিবাস হিসেবে চিনি। যাত্রী পরিবহনে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিশান কোম্পানির। এটাও ঝকঝকে। আমি কেন এই বিশেষণ জুড়ে দিচ্ছি, তার কারণ হলো এদের গাড়িগুলোর প্রতি যত্ন অসীম। মানুষেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

রাস্তার দুই ধারে বসতি তেমন চোখে পড়ল না। মাঝে মাঝে ঝুপড়ি দোকান-জাতীয় কিছু একটা হয়তো থাকে। রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে খানিক বাদে চাষবাস। বেশির ভাগই সবুজ সবজি-জাতীয়। তবে একনাগাড়ে চলে যাওয়া বা বৃহৎ কোনো খেত দেখতে পেলাম না। তার মানে হয়তো চাহিদা কম। নয়তো চাষের জন্য যে খরচ, তা বহন করা কঠিন কৃষকদের জন্য। মিনিট পনেরো পরে ওরা এল। এবার বলে দেওয়া হলো সামনের এক ঘণ্টার আগে আর কোনো থামা নেই। খাওয়াও ওখানেই। আজ আমাদের ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটারের মধ্যে থাকার জায়গা পাওয়ার কথা। এভাবে গেলে কষ্ট হবে। কিন্তু এ-ও ঠিক, চঞ্চলদের জন্য রাস্তার ডান দিক দিয়ে প্রথম চালানো হয়তো কিছুটা মানসিক অস্বস্তি তৈরি করতে পারে। কিছু সময় চালানোর পর ঠিক হয়ে যাবে, সে ভরসা করছি। আমরা বাংলাদেশ বা আশপাশের দেশগুলোতে রাস্তার বাঁ দিকে চালাই। যাঁরা চার চাকার গাড়ি চালান, তাঁরা গাড়ির সামনের ডান দিকে বসেন। মাদাগাস্কারে এটা উল্টো। এখানে আমরা রাস্তার ডান দিকে চালাচ্ছি। আর চার চাকার গাড়িতে চালকের আসন বাঁ দিকে, যাকে বলে লেফট হ্যান্ড ড্রাইভ।

টানা চালালাম। ত্রিশের কাছাকাছি হয়েছে। বিরতি নেওয়া যায়। এবার পেট্রলপাম্পে থামা হলো। একে ঝকঝকে তকতকে বলতেই হচ্ছে। তেল নেওয়ার জায়গা পার হয়ে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। তাতে হালকা খাবার ও কফি খেলাম। এখানে দারুণ টয়লেট আছে। যাত্রীসেবার মানের কথা বলা হলে এটা যেকোনো উন্নত দেশের সমমর্যাদাসম্পন্ন বিনা বাক্যে। দুজন তরুণী দোকান সামলাচ্ছেন। মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে ফরাসি ভাষায় স্বাগত জানালেন। কফি খাওয়া হয়নি সকাল থেকে। নেওয়া হলো। সঙ্গে বিস্কুটের প্যাকেট। দোকানের ভেতরে বসতে বললেও আমরা বাইরে দাঁড়ালাম।

আবহাওয়া দারুণ। গ্যাস স্টেশন হলেও ঘন ঘন গাড়ি আসছে না। পুরোটা কংক্রিটের মেঝে হওয়ায় ধুলা কম।

বড়জোর কুড়ি কিংবা পঁচিশ মিনিট চালিয়েছি, চঞ্চলদের দেখা নেই। শেষবার যখন দেখা গেছে, তখনো তারা অনেক পেছনে। ঢাল মাড়াতে হচ্ছে। একে তুলনায় আনাড়ি, তার ওপর ঢাল—দুয়ে মিলে ওদের অবস্থা ত্রাহি। অপেক্ষা ছাড়া উপায় কী? এগিয়ে যাওয়া যায়, তবে আমরা আমাদের গতিতে এগিয়ে যেতে থাকলে ওরা আমাদের টিকিটিও দেখতে পারবে না দিনের শেষ অবধি ছাড়া। তা আমরা চাইছি না।

ঘড়ির কাঁটা ১০টা ৩০ ছুঁই ছুঁই। রাস্তার সঙ্গেই বড় একটা সাইনবোর্ড দেখলাম। নিচ দিয়ে লাল মাটির কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। সাইনবোর্ডে লেখা ফরাসি ও ইংরেজি শব্দে—ন্যাশনাল ইয়ুথ ইনস্টিটিউট। একটা মুদিখানা আছে। সাইনবোর্ডের সঙ্গেই লাগোয়া। এখানেই অপেক্ষা করা উত্তম। বিরতিতে খাওয়া আর দেখাও যাবে। দোকানে গিয়ে জানতে পারলাম, যুবাদের প্রতিষ্ঠান এখান থেকে আরও দূরে। রাস্তার যা নিদারুণ অবস্থা, সাইকেলে সাহস হলো না। বিরতিতে জলযোগ ছাড়া আর কিছু করার নেই।

আপদের নাম পাংচার

একটা গাড়ি এসে থামল সামনে। যাত্রীবাহী গাড়ি। নামবে কেউ। হায় খোদা! দেখি, সালমা আপা নামছে। হাতে সাইকেলের একটা চাকা! প্রথমে দেখে আঁতকে উঠলেও পরে বুঝতে পারলাম সমস্যার ভয়াবহতা কম, যা ভেবেছি তা-ই । চাকা পাংচার হয়েছে!

শতবার বলেও তাদের চাকার পাংচার সারানোর বিদ্যাটুকু শেখানো যায়নি। এই সমস্যা অনেক দিনের। শুধু এই ট্রিপেই যে হয়েছে, তা নয়। প্রায় প্রতি ট্রিপে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়।

ভালোর ভালো এই যে তারা সমস্যাটা বুঝতে পেরেছে দ্রুত। না হলে হাওয়াহীন চাকায় সাইকেলটা যদি বেশিক্ষণ চালাত, তবে টিউব-টায়ার আর রিমটার বারোটা বেজে যেত।

তারা খুব বেশি পেছনে নেই। তাই সময় লাগবে না চালিয়ে এ পর্যন্ত আসতে। পাংচার সারানোর পর আরেকটা গাড়ি থামিয়ে তিনি চলে গেলেন। এখানে রাস্তায় তাড়াহুড়ো নেই। একে ফাঁকা রাস্তা, তার ওপর হাতে গোনা গাড়ি। তাই যখন যেখানে খুশি ওঠা কিংবা নামাও যায়। গাড়ি পেতে সমস্যা হয়নি আর হবে বলেও মনে হয় না।

আসতে সময় নিল আরও আধঘণ্টা। বসে বসে পায়ে মরিচা পড়ে যাওয়ার দশা। শঙ্কা ঢুকে গেছে মনে। যে হারে সাইকেলের সমস্যা দেখা দিচ্ছে, এমনটা চলতে থাকলে কষ্ট বাড়তে থাকবে। লাগাতার চালাতে থাকলে শরীর সেভাবে মানিয়ে নেয়। এমন আধঘণ্টা চালিয়ে আধঘণ্টা বসা হলে সর্বনাশ। যতটা পারা যায় দ্রুত চালাতে থাকব—এই কথা হলো দুই দলের। দুপুরের খাবারের জন্য আর ঘটা করে থামার দরকার পড়বে না। যতবার থামা হলো, ততবারই কিছু

না কিছু খাওয়া হয়েছে। এগিয়ে যাই।

যত তাড়াতাড়ি চালানোর ইচ্ছা ছিল, তা আর হলো না। রাস্তায় অসংখ্য ঢাল। কোনোটা বড়, কোনোটা ছোট। আছে চোরা ঢালও। দেখতে মনে হবে সমতল কিন্তু চালাতে গেলে বোঝা যাবে উঠছি ধীরে ধীরে। এই ঢালগুলো জীবনীশক্তি খেয়ে ফেলে। মানসিকভাবে পরাস্ত হতে হয়। সামান্য সময়ের জন্য কয়েকবার থামা হলেও বড় কোনো বিরতি আর নেওয়া গেল না। দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু পথ সে হারে কমছে না। তিনটা নাগাদ আমরা একটা বাজার দেখতে পেলাম । বাংলাদেশের গ্রামের মতোই। রাস্তার দুই ধারে আভিজাত্যহীন দোকান। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আর অলস কিছু মানুষ। এদিক সমতল বলে সাইকেল বেশ। রিকশাও আছে, তবে একটু আলাদা। এর বিবরণ পরে দেওয়া যাবে। আমরা এগিয়ে যাই বাজারের মাঝবরাবর। পেছনে চঞ্চলদের আবার হাঁটতে দেখা গেল। ভালোর ভালো যে খুব বেশি পেছনে ছিল না। পেছনের চাকায় পাংচার!

সাইকেলের ডাক্তার

বাজারে মেকানিক পাওয়া গেল। ছেড়ে দিলাম তাদের হাতে। বিকেলের আলোয় সোনালি কারুকাজে বাজারের লাল মাটির রং সোনারচরের বালুর মতো মনে হচ্ছে। উপভোগ্য হচ্ছে না সাইকেলের এই বিরামহীন যন্ত্রণায়। এমন হয়নি কখনো। এতবার এক সাইকেলে এত সমস্যা, তা-ও এক দিনে।

একসঙ্গে শুরু করেও দুই দলের তাল রাখা দায় হয়ে গেল। আমরা এগিয়ে যেতে যেতে একসময় তাদের হারিয়ে ফেললাম আবার। দৃষ্টির অগোচরে চলে গেছে। পথ হারানোর ভয় নেই। তাই নিজেরা এগিয়ে গেলাম। সামনে কোনো বসার জায়গা বা দোকান পেলে থামা যাবে। থামলামও। রাস্তার ধারের এক ফলের দোকানে নানা ফলের পসরা সাজানো। খুদে লোকালয়। এক সারিতে কয়েকটা বাড়ি। মান্ধাতার আমলের। পলেস্তারা খসে খসে গেছে। মলিন হয়ে গেছে টালিগুলো। বিকেলের রোদের উষ্ণতা হারিয়ে গেছে আগেই। এবার ঠান্ডা লাগছে। এমন ছোট লোকালয় ঠিক আমাদের দেশের মতোই। দিনের বিশেষ কোনো সময় জমজমাট হয়। দু-একজন মানুষের আনাগোনা। আমাদের সাইকেলটার প্রতি দৃষ্টি সবার। তবে বাংলাদেশের মতো হাত দিয়ে টেপাটিপি করার প্রবণতা দেখা গেল না।

চিন্তায় পড়ে গেলাম। এখনো আসছে না। আধঘণ্টার বেশি বসে থাকলাম। কী করা যায়? এগিয়ে যাব? ঢাল বেয়ে উঠে এসেছি। নেমে যেতে সময় লাগবে না যদিও। কিন্তু ক্লান্ত আমরাও। সাইকেল রেখে হাঁটাপথে এগিয়ে গেলাম। শামিমা আপাকে একা সাইকেল পাহারায় রেখে যেতেও সাহস হচ্ছে না। যত দূর পর্যন্ত উনি আমার দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকবেন, তত দূর অবধি যাব। ফোনে ট্রাই করা হলো। নেটওয়ার্ক কাজ করছে না। তা-ও এক কিলোতে হবে। হেঁটে এগিয়ে এসে একটা বাঁক থেকে শামিমা আপাকে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। অপর দিকে দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া পিচঢালা পথ। তাদের কোনো দেখা নেই। আর এগিয়ে যেতে পারছি না। তাহলে শামিমা আপার সবুজ জ্যাকেটটা দেখা যাবে না। দুজন একসঙ্গে যখন আছে, কিছুটা ভরসা করা যায়। কিন্তু একা একজনকে ফেলে আসা ঠিক হবে না। এমন সময় দূরে এক বিন্দুর মতো চঞ্চলের গেরুয়া জ্যাকেট দেখতে পেলাম। সাইকেল আছে। গতি ধীর, তবে আসছে। আমি আবার দোকানের দিকে হাঁটা ধরলাম। যাবতীয় নাটকের অবসান ঘটিয়ে চঞ্চলরা আরও আধঘণ্টা বাদে আমাদের সঙ্গে

যোগ দিল, ‘আর বইলেন না। সামনে চাকা পাংচার হইছিল মাঝপথে। আবার পেছনের বাজারে গিয়ে সারিয়ে নিয়ে আসতে হলো। গাড়ি যা ছিল সাইকেল নেওয়া যেত না।’

এই হলো ব্যাখ্যা। মোক্ষম অবস্থা।

আরও ১৫ কিলোমিটারের রাস্তা বাকি

যদি আর কোনো সমস্যা না-ও হয়, তবু রাস্তার যে অবস্থা, তাতে আমাদের কমসে কম দুই ঘণ্টা টানা চালাতে হবে। এখন পাঁচটা। কোনোমতেই সাতটার আগে গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে না। তাই আর যা-ই হোক, পায়ে চাপ দিতে হবে। জান দিয়ে প্যাডেল না মারলে এই পথে রাতে সাইকেল চালানো অসম্ভব। এই বিপদের ঠাওর সবাই করতে পেরেছিল। সড়কবাতির কোনো নমুনা শহর ছাড়ার পর চোখে পড়েনি। তাই জান বাজি রেখে চালাতে হবে।

বাজির ঘোড়দৌড়ে হারতে হলো এবারও। যত না আশা ছিল ফলাফল তার থেকে আশঙ্কাজনক রকম খারাপ। রাত না সন্ধ্যা বলব? এখন আটটা বাজে। আলো আছে। মিহিদানার মতো আবছা হয়ে আসছে ক্রমে। দূরে পাহাড়ের গায়ে ঢলে পড়া সোনালি কিরণে কয়েকটা বাড়ির ছাদে টিভির অ্যানটেনা দেখা যাচ্ছে। আমরা একটা ত্রিবেণী সংগমে বসে আছি চঞ্চলদের অপেক্ষায়। নেটওয়ার্ক আছে। কথা হয়েছে। তারা আসছে। গুগল ম্যাপ বলছে, এই সংগম থেকে ডানে যেতে হবে। তিন কিলো পরে হোটেল পড়বে। সঙ্গে আছে একটা লেক। ম্যাপে দেখাও যাচ্ছে। তিন কিলো যাওয়া যাবে। সে যত রাতেই হোক। আসুক ওরা। একসঙ্গে না গেলে খুঁজতে হবে আবার।

একসঙ্গে ডানের রাস্তা ধরলাম। কোনো একসময় ইট বিছানো হয়েছিল। সেটা বোঝা যাচ্ছে মাঝে মাঝে দু-একটা থান বিষফোড়ার মতো কুঁজো হয়ে বেরিয়ে আছে সুরকির ওপর। এটা রাস্তা নাকি পুলসিরাত, আল্লাহ মালুম! ধীরে না চালালে সাইকেলের স্পোক যাবে নির্ঘাত। দুদিকে ঘন জঙ্গল। মিহিদানা অন্ধকার সাগুদানায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে। রাত নামছে দ্রুতই। কিন্তু সাইকেল সেই তালের বিপ্রতীপে। লেকটা চলে এল আচমকাই। এখানে আলো আছে। খোলা জায়গা, বিশাল লেকটাকে আঁধার গ্রাস করতে পারেনি। কিন্তু কোথাও কেউ নেই!

এ কোন জায়গায় এলাম। হায়, গুগল তুমি কোথায় নিয়ে এলে এই রাত্রিবেলা। এখানে পাঁচ হাজার ওয়াটের মাইকে আওয়াজ করলেও কেউ শুনতে পাবে না। হোটেল কেন, কোনো গরুর গোয়ালও চোখে পড়ছে না। এটা একটা মৎস্য খামার। তার সাইন আছে। ইংরেজি অক্ষরে ফরাসি ভাষায়। কিন্তু মাছের ছবিসমেত। তো ধরেই নিলাম মৎস্য খামার। হলেও কী, না হলেও কী। (চলবে)

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
স্বত্ব © ২০২৩ প্রথম আলো